

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা. ছাদিয়া খাতুন

রোলঃ 227020439

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

Through Knowledge towards Jannah

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা. ছাদিয়া খাতুন

রোলঃ 227020439

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ পশ্চিমা সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা. ছাদিয়া খাতুন, আইডিঃ 227020439 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ পশ্চিমা সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মোছা. ছাদিয়া খাতুন

আইডিঃ 227020439

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

No table of contents entries found.

Contents

অধ্যায় ১	5
সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয়	5
১.১ সভ্যতা:	5
১.২ সংস্কৃতি	6
১.৩ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাঝে পার্থক্য	7
পৃথিবীতে বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান	8
মিশরীয় সভ্যতা	8
মেসোপটেমীয় সভ্যতা:	10
সুমেরীয় সভ্যতা	11
ব্যাবিলনীয় সভ্যতা:	11
রোমান সভ্যতা	12
গ্রিক সভ্যতা	16
অধ্যায় ২	18
পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ	18
পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিচয়	19
যেভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা গড়ে ওঠেছে:	19
ইউরোপীয় রেনেসাঁস	19
ধর্ম সংস্কার আন্দোলন	20
প্রতিসংস্কার আন্দোলন	21
এনলাইটেনমেন্ট: আলোকিত যুগ	22
২.৩ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন দিক	23
২.৩.১ বিশ্বাস	23
২.৩.২ পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রব্যবস্থা	24
২.৩.৩ পাশ্চাত্যের অর্থব্যবস্থা	24
অধ্যায় ৩	25

ইসলামী সভ্যতার স্বরূপ	25
৩.১ ইসলামি সভ্যতা	25
৩.২ ইসলামী সভ্যতার বিভিন্ন দিক	26
৩.২.১ বিশ্বাস/আকিদা	26
৩.২.২ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা/খিলাফত	27
৩.২.৩ ইসলামী অর্থনীতি	28
৩.২.৪ ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা	28
অধ্যায় ৪: ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব	31
৪.১ ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দের কারণ	31
১. বিশ্বাস ও আদর্শের পার্থক্য	31
২. নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পার্থক্য	31
৩. ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মীয় কর্তৃত্ব	32
৪. শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা	32
৫. সংস্কৃতি ও জীবনধারা	32
৬. রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব	32
৪.২ মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব	32
মিশরে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব	32
ভারতবর্ষে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব	33
মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কেনো পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করছে?	34

অধ্যায় ১

সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয়

১.১ সভ্যতা:

পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্যতার উদ্ভব মানুষের সবচেয়ে বড় অর্জন বলে সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকসহ সকলে মনে করেন। সভ্যতার ইংরেজি ‘Civilization’ শব্দের উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ ‘Civitas’ থেকে যার অর্থ নগর বা নাগরিক। অর্থাৎ Civilization দিয়ে নগরের নাগরিকদের বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। দার্শনিক ভলতেয়ার সর্বপ্রথম ‘Civilization’ শব্দটি ব্যবহার করেন। তবে সভ্যতার সুনির্দিষ্ট সঙ্গা দিতে

গিয়ে সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকসহ বিভিন্ন পণ্ডিত ও চিন্তাবিদরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যেমন :

- 1) আলফ্রেড ওয়েবার (Alfred Waber) বলেন, "Civilization is meant primarily scientific and technical knowledge and the command which they give over natural resources."
- 2) ই. বি. টেইলর (E.B. Taylor) বলেন, "A civilization is a culture which has attained a degree of complexity usually characterized by urban life."
- 3) জার্মান দার্শনিক অসওয়াল্ড স্পেন্গলারের (Oswald Spengler) মতে, "সভ্যতা বলতে উৎকর্ষ সাধিত সংস্কৃতির চূড়ান্ত রূপকে বুঝায়"

অর্থাৎ, কোন জাতি বা সাম্রাজ্য উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছলে তাকে সংস্কৃতি বলে। উচ্চ পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর কোন জাতি বা সাম্রাজ্য যখন আর সংস্কৃতির বিকাশ লাভ করতে পারে না, তখন সংস্কৃতি ক্রমশ সভ্যতায় উপনীত হয়। এভাবে সভ্যতার বিভিন্ন সংজ্ঞা দেয়া হলেও বলা যায় যে, সভ্যতা হচ্ছে উন্নত সংস্কৃতি। লিখন পদ্ধতির পর্যাপ্ত ব্যবহারসহ যখন কোন সংস্কৃতি অগ্রগতির একটি স্তরে উপনীত হয় তখন সেই সংস্কৃতি সভ্যতা নামে অভিহিত হওয়ার দাবি রাখে। অন্যভাবে বলা যায়, সংস্কৃতি যখন একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছায়, যখন বিজ্ঞান ও শিল্পকলার কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়, যখন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কিছু নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠা করে একটি জটিল সামাজিক কাঠামোকে নিরাপত্তা প্রদান করার ক্ষমতা অর্জন করে, তখন তাকে সভ্যতা বলে। তবে সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক বিষয় নয়। এদের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান।

১.২ সংস্কৃতি: সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জীবন যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতি শব্দটির আভিধানিক অর্থ চিত্তপ্রকর্ষ বা মানবীয় বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ সাধন। ইংরেজি 'Culture'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃতি শব্দটি ১৯২২ সালে বাংলায় প্রথম ব্যবহার করা শুরু হয়। কোন স্থানের মানুষের আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতি-নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়, তাই সংস্কৃতি। উক্ত বিষয়গুলোকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমভাগ নিত্যদিনকার জীবনযাপনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। আর দ্বিতীয়ভাগ জীবন উপভোগের ব্যবস্থা এবং উপকরণের সাথে

সম্পর্কিত।^১ মানুষের বিভিন্ন ধ্যান ধারণা, চিন্তাভাবনা, আচরণ পদ্ধতি, নৈতিক আদর্শ-এ সমস্তের উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ। আর এভাবেই মানুষ গড়ে তোলে সংস্কৃতি। 'সংস্কৃতি' শব্দটি মূলত মানুষের বিচারবুদ্ধি ও চিন্তাভাবনারই প্রতিফলন, যা মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই সূচিত হয়েছে এবং যার মাধ্যমে মানুষ মানসিক ও আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করে।

১.৩ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাঝে পার্থক্য: সভ্যতা ও সংস্কৃতি শব্দ দুটির মাঝে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন:

১. জীবন পরিচালনার জন্য এবং জীবনের গতিকে উৎকর্ষ ও সাবলীল করতে যা কিছু সাহায্যকারী তা সভ্যতা নামে অভিহিত। কিন্তু মন-মানস ও আত্মার কামনা-বাসনা ও সুস্বাদু আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের উপায়-উপকরণকেই বলা হয় সংস্কৃতি।

২. সভ্যতা ক্রম-বিকাশমান, প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল, তা নিত্য-নতুন দিগন্তের সন্ধানী। কিন্তু সংস্কৃতি প্রাচীনপন্থি। প্রাচীনতম দৃষ্টিকোণ ও মতাদর্শ থেকে সম্পর্কহীন হওয়া তার পক্ষে কঠিন।

৩. সভ্যতা দেশের সীমা-বন্ধনমুক্ত বিশ্বজনীন ভাবধারাসম্পন্ন। প্রায় সব চিন্তা-বিশ্বাসের লোকদের পক্ষেই তা গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু সংস্কৃতির উপর পরিবেশ ও ভৌগোলিক বিশেষত্বের ব্যাপক প্রভাব যুক্ত থাকে; অর্থাৎ সংস্কৃতি আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বহুলাংশে বন্দি; কেবল সমমতের লোকদের পক্ষেই তা গ্রহণযোগ্য হয়। যেমন: মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধদের সাংস্কৃতিক মেজাজ-প্রকৃতির উপর তাদের বিশেষ ধর্মের সর্বাঙ্গিক প্রভাব বিরাজমান। সেই সঙ্গে উপমহাদেশের একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতির দিক দিয়ে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মুসলমানদের থেকে বহুলাংশে ভিন্নতর।

৪. সভ্যতা মানুষের বাহ্যিক জীবন নিয়ে আলোচনা করে। বস্তুগত প্রয়োজনাবলিই তার মূলক্ষেত্র। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও বিভিন্ন শৈল্পিক দুর্লভ উপকরণ ও প্রতিষ্ঠানাদি (সভ্যতার মহাকীর্তি) এক দেশ ও জাতি থেকে ভিন্নদেশ ও জাতির মধ্যে

^১ বদরুদ্দীন উমর, সংস্কৃতির সংকট, মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৯৮৪, ২৭ পৃ.

চলে যায়। অনুন্নত জাতিগুলোও তা থেকে উপকৃত হয়। স্বভাব-প্রকৃতিগত পার্থক্য তার পথে বাধা হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই তা ব্যবহার করে কল্যাণ লাভ করতে পারে। তার কল্যাণ লাভে কোন প্রতিবন্ধকতাই নেই। বাছাই-প্রক্রিয়াও এখানে অচল।

সংস্কৃতি আভ্যন্তরীণ জীবন-কেন্দ্রিক। সংস্কৃতি হচ্ছে মন ও মগজ কেন্দ্রিক আবর্তন-বিবর্তনের স্বতঃস্ফূর্ত ও উন্মুক্ত বহিঃপ্রকাশ। এই কারণে সংস্কৃতি স্বাধীন-মুক্ত সমাজ-পরিবেশেই যথার্থ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।²

পৃথিবীতে বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান

মিশরীয় সভ্যতা: মিশরীয় সভ্যতা: মিশরকে বলা হয় নীলনদের দান। এই নীলনদকে কেন্দ্র করেই সভ্যতা গড়ে ওঠে। মিশরীয় সভ্যতা উত্তর আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলের একটি প্রাচীন সভ্যতা। নীল নদের নিম্নভূমি অঞ্চলে এই সভ্যতা গড়ে ওঠে। বর্তমানে অঞ্চলটি মিশর রাষ্ট্রের অধিগত। খ্রিষ্টপূর্ব ৩১৫০ অব্দ নাগাদ প্রথম ফারাওয়ের অধীনে উচ্চ ও নিম্ন মিশরের রাজনৈতিক একীকরণের মাধ্যমে এই সভ্যতা এক সুসংহত রূপ লাভ করে। এরপর তিন সহস্রাব্দ কাল ধরে চলে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার বিকাশপর্ব। প্রাচীন মিশরের ইতিহাস একাধিক স্থায়ী রাজ্য-এর ইতিহাসের একটি সুশৃঙ্খলিত ধারা। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতার পর্ব দেখা দিয়েছিল। এই পর্বগুলি অন্তর্বর্তী পর্ব নামে পরিচিত। নতুন রাজ্যের সময়কাল এই সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশপর্ব। এর পরই ধীরে ধীরে মিশরীয় সভ্যতার পতন আরম্ভ হয়। প্রাচীন মিশরের



গিজার পিরামিড

ইতিহাসের শেষ পর্বে একাধিক বৈদেশিক শক্তি মিশর অধিকার করে নেয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৩১ অব্দে আদি রোমান সাম্রাজ্য মিশর অধিকার করে এই দেশকে একটি রোমান প্রদেশে পরিণত করলে ফারাওদের শাসন আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হয়।

² মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ খান, সভ্যতার এপিঠ ওপিঠ, পৃ.১৯



প্রাচীন মিশরের মানচিত্র

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সাফল্যের আংশিক উৎস নিহিত রয়েছে নীল নদ উপত্যকার পরিস্থিতির সঙ্গে এই সভ্যতার মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার মধ্যে। সুপরিচিত বন্যা ও উর্বর উপত্যকার নিয়ন্ত্রিত সেচব্যবস্থার ফলস্রুতি ছিল উদ্বৃত্ত ফসল। যা থেকে এই অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এই সম্পদের সাহায্যেই প্রশাসনের সহায়তায় উপত্যকা ও পার্শ্ববর্তী মরু অঞ্চলে খনিজ পদার্থের উত্তোলন শুরু হয়, একটি স্বাধীন লিখন পদ্ধতি আদি বিকাশ সম্ভব হয়, স্থাপনা ও কৃষিজ পণ্যের সুসংহত ব্যবহার শুরু হয়, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং সামরিক বাহিনী বহিঃশত্রুদের পরাজিত করে মিশরীয় প্রাধান্য স্থাপন করে। এই সকল কার্যে প্রেরণা জোগানো ও একে সুসংহতরূপে সাধন করা ছিল উচ্চবিত্ত লিপিকার, ধর্মনেতা ও ফারাওদের অধীনস্থ প্রশাসকবৃন্দের আমলাতন্ত্রের নিদর্শন। এঁরা সমগ্র মিশরের জনগণকে একটি বহুব্যাপী ধর্মবিশ্বাসের বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদের সহযোগিতা ও একতাকে সুনিশ্চিত করেছিলেন।

প্রাচীন মিশরীয়দের নানান কৃতিত্বগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য খনি থেকে অটালিকাদি নির্মাণের জন্য পাথর খনন, সমীক্ষণ ও নির্মাণ কৌশলের দক্ষতা। এরই ফলস্রুতি ঐতিহাসিক মিশরীয় পিরামিডসমূহ, মন্দির, মিশরীয় গণিত ব্যবস্থা, একটি ব্যবহারিক ও কার্যকরী চিকিৎসা ব্যবস্থা, সেচব্যবস্থা ও কৃষি উৎপাদন কৌশল, প্রথম জাহাজ নির্মাণ, মিশরীয় চিনামাটি ও কাঁচশিল্পবিদ্যা, একটি সাহিত্য এবং বিশ্বের ইতিহাসের প্রাচীনতম শাস্তিচুক্তি (হিট্টাইটদের সাথে)। প্রাচীন মিশর এক দীর্ঘস্থায়ী উত্তরাধিকারকে পিছনে ফেলে যায়। প্রাচীন মিশরের শিল্পকলা ও সাহিত্যের ব্যাপক অনুকৃতি লক্ষিত হয়। বিশ্বের দূরতম প্রান্তে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এর পুরাকীর্তিগুলি। শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রাচীন মিশরের পুরাকীর্তিগুলির ধ্বংসাবশেষ পর্যটক ও লেখকদের কল্পনাশক্তিকে

অনুপ্রাণিত করেছে। আধুনিক যুগের প্রথম ভাগে পুরাকীর্তি ও খননকার্যের প্রতি নতুন করে মানুষের আগ্রহ জেগে উঠলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মিশরের সভ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু হয়। এর ফলে মিশরীয় সভ্যতার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারগুলি মিশর ও বিশ্ববাসীর সম্মুখে নতুন রূপে উপস্থাপিত হয়।³



প্রাচীন মিশরীয়দের কিছু শিল্পকর্ম

মেসোপটেমীয় সভ্যতা:

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলো যেসব নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল এর মধ্যে ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস ফোরাতে-দজলা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের মেসোপটেমিয়া সভ্যতা অন্যতম। গ্রীক লেখনীতে (সর্বপ্রথম মেসোপটেমিয়া নামটি ব্যবহার করা হয়। মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ ৪,০০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দের পর এ অঞ্চলের সভ্যতা গড়ে উঠতে থাকে। এ ভূখণ্ড আরব মরুভূমির উত্তর অঞ্চলকে এমনভাবে ঘিরে আছে

³ <https://bn.wikipedia.com>

যে এর আকৃতি দেখতে অর্ধচন্দ্রের মত। ভূগোলবিদ ব্রেস্টেড (Breasted) এ কারণে এ অঞ্চলের নাম দিয়েছেন 'উর্বর অর্ধচন্দ্রিকা' (Fertile Crescent)। পশ্চিমে মিশর থেকে শুরু করে পূর্ব পারস্য উপসাগরের তীর পর্যন্ত এ উর্বর এলাকা বিস্তৃত। এ উর্বর ভূমিতে কৃষির উপর ভিত্তি করে প্রাচীনকালে উন্নত সভ্যতা গড়ে ওঠে ছিল। যদিও এখানে মেসোপটেমিয়া নামে কোন একক সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতি এখানে সভ্যতা গড়ে তোলে। এখানে গড়ে ওঠে সুমেরীয়, আক্কাদীয়, ব্যাবিলনীয়, ক্যাসাইট, এসেরীয় ও ক্যালডীয় সভ্যতা। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে এসব সভ্যতার নিদর্শন ও নগর আবিষ্কার হয়েছে। এর থেকে এসব সভ্যতার অবদান সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য বেরিয়ে আসছে। অবশ্যই এসব সভ্যতার মধ্যে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, এসেরীয় ও ক্যালডীয় সভ্যতা বিভিন্ন অবদানের দ্বারা সভ্যতার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। এ চারটি সভ্যতা নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে।⁴

সুমেরীয় সভ্যতা: সুমেরীয় সভ্যতা মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশের একটি প্রাচীন সভ্যতা। এর অবস্থান ছিল আধুনিক রাষ্ট্র ইরাকের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে। সুমেরীয় সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০০ হতে খ্রিষ্টপূর্ব ১৯০০-এর মধ্যে। ব্যাবিলন সভ্যতার উত্থানের সাথে সাথে সুমেরীয় সভ্যতার পতন ঘটে। সুমেরীয় সভ্যতাকে পৃথিবীর প্রথম সংগঠিত সভ্যতা হিসাবে গণ্য করা হয়। সুমেরীয়রাই প্রথম মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। তাদের বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম “গিলগামেশ”।⁵ অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতার ধর্মের মত সুমেরীয়রা বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টিসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভীত সন্ত্রস্ত থাকত। তাই প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখতে তারা তাদের দেব-দেবী হিসেবে পূজা করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল প্রত্যেক দেব-দেবীই স্বতন্ত্র মানবীয় গুণাবলী দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তারা আরো মনে করতো দেব-দেবীদের সেবা করার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের প্রধান দেব-দেবী ছিল-১. শামাশ (Shamash), ২২. এনলিল (Enlil), ৩. ইশতার (Ishtar), ৪. নারগল (Nergal) ১৫. এনকি (Enki)।⁶

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা: ব্যাবিলন শব্দটির উৎপত্তি সেমিটিক শব্দ ‘বাব ইল’ থেকে। যার অর্থ দেবতার নগর। গ্রীকরা এ নামকরণ করেছে। ব্যাবিলন সভ্যতায় রাজা হাম্মুরাবী ছিলেন সবচেয়ে দুর্ধর্ষ, প্রশাসক, আইন সংকলক। সিরিয়ার মরুভূমি অঞ্চলে

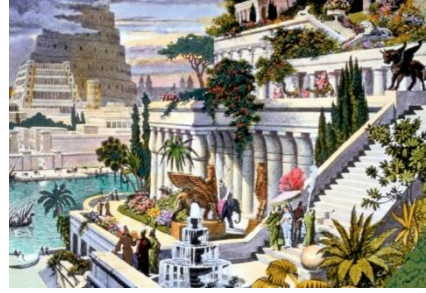
⁴ ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন, ড. মো: আব্দুল কুদ্দুস সিকদার, সভ্যতার ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), পৃ.১৩৪

⁵ <https://bn.wikipedia.com>

⁶ ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন, ড. মো: আব্দুল কুদ্দুস সিকদার, সভ্যতার ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), পৃ.১৪০

অ্যামোরাইট নামের এক জাতি বাস করত। এরা খ্রীষ্টপূর্ব 1894 অব্দে মেসোপটেমিয়ায় এসে সুমের ও আক্কাদ নগরীর মাঝামাঝি ব্যাবিলন নামক স্থানে একটি সভ্যতা গড়ে তোলে। এটিই ব্যাবিলন সভ্যতা নামে পরিচিত। ব্যাবলনীয় সমাজ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলো। উচ্চ শ্রেণীতে ছিলো রাজা, পণ্ডিত, পুরোহিত ও সৈন্য। এদের নিজস্ব জমি ছিলো। শিল্পী ও স্বাধীন ব্যবসায়ীরা ছিলেন মধ্য শ্রেণীতে। আর নিম্ন শ্রেণীতে ছিলো কৃষক, সাধারণ শ্রমিক ও দাসরা। ব্যাবলনীয় সমাজে যুদ্ধবন্দীদের দাস করা হতো।⁷ প্রাচীন ব্যাবিলনে ‘কিউনিফর্ম’ অর্থাৎ কিলক আকারের লিখন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই পদ্ধতি প্রাচীন মিশনের ‘চিত্রলিখন’ পদ্ধতি অপেক্ষা উন্নত ছিল। ব্যাবিলনীয় ভাষা ছিল ৩০০ ধ্বনি চিহ্নবিশিষ্ট। ব্যাবিলনের বিখ্যাত ‘শূন্য উদ্যান’ পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম। শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যাবিলনীয়রা উন্নত ছিল। কাচশিল্পের উন্নতি সাধন ও প্রসারে তাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।⁸

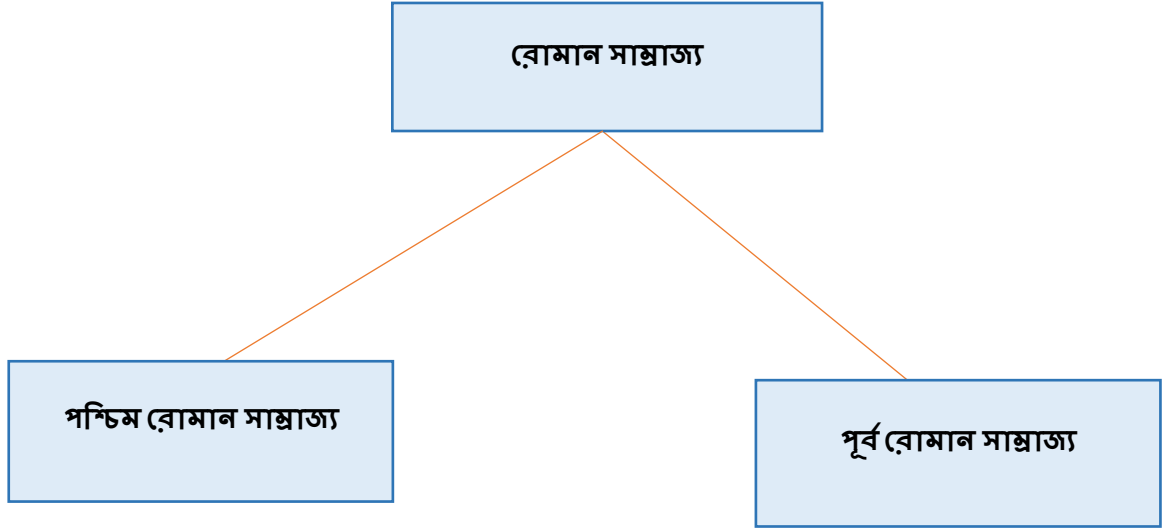
হাতে রঙ করা খোদাইকৃত
ঝুলন্ত উদ্যান



রোমান সভ্যতা: গ্রীক সম্রাট যখন বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল তার পূর্বেই ভূমধ্যসাগরের মধ্য অঞ্চলে তথা ইতালির টাইবার (Tiber) নদীর তীরে আরেকটি সভ্যতার উদয় হয় যা রোমান সভ্যতা নামে পরিচিত। খ্রিষ্ট পূর্ব আট শতকে ইতালি উপদ্বীপের একটি গ্রাম হিসেবে রোমের যাত্রা শুরু এবং ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে রোম নগরীর পতন ঘটে। উত্থান-পতনের মধ্যবর্তী সুদীর্ঘকালব্যাপী রোমানগণ প্রাচীনকালের বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এরা ল্যাটিন নামে পরিচিত হয় এবং এদের ভাষাও ল্যাটিন নামে পরিচিতি লাভ করে। এই জনগোষ্ঠীরই একজন রাজা রোমুলাস (Romulus) রোম নগরীর পত্তন করেন বলে ধারণা করা হয় এবং তাঁরই নামানুসারে নগরীর নাম দেয়া হয় রোম। রোমান সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন:

⁷ <https://bn.wikipedia.com>

⁸ <https://bn.kalerkontho.com>



পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন জুলিয়াস সিজার ও অগাস্টাস সিজার। রোমান সাম্রাজ্যের ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পতনের পর পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নামে তাদের শাসন বজায় রাখে। এ সাম্রাজ্যের বিখ্যাত শাসক ছিলেন সম্রাট জাস্টিনিয়ান। রোমান সাম্রাজ্য ছিল বিশাল এক সাম্রাজ্য। প্রাচীন গ্রীক উপনিবেশ বাইজেন্টাইন ছিল রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলভুক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকা। ভৌজেন্টাইন মরমর সাগরের মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী বসফরাস প্রণালীর পশ্চিম তীরে (এ অংশ ইউরোপের সাথে সংযুক্ত) বাইজেন্টাইনের অবস্থান। তাছাড়া ইউরোপ ও এশিয়া ক্ষমতা দখলে ইউরোপের কোন শত্রু এশিয়া মাইনর হয়ে বাইজেন্টাইনের কোন অংশ আক্রমণ সহ শক্তিমীর মরাদেশকে পৃথককারী ভূমধ্যসাগর কৃষ্ণ সাগরের সাথে জলপথে বাইকেডিয়াে ছিল সহজ যোগাযোগ। তাছাড়া প্রাকৃতিকভাবেও বাইজেন্টাইনের ছিল সুরক্ষিত। কারণ করতে চাইলে তাকে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর অতিক্রম করতে হতো- যা ছিল খুব কষ্টসাধ্য এবং একই সঙ্গে এ আক্রমণ মোকাবেলাও ছিল বাইজেন্টাইনের জন্য সহজ সাধ্য। অন্যদিকে, এ শহরটি দেয়াল ও দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় বাইরে থেকে শহরে প্রবেশও ছিল খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অবস্থানগত কারণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপন এবং নিরাপত্তা সুবিধার কথা বিবেচনা করে রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বাইজেন্টাইনে রোমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। বাইজেন্টাইনে রাজধানী স্থাপনের পর সম্রাট কনস্টান্টাইনের নামানুসারে এ রাজধানীর নতুন নামকরণ হয় কনস্টান্টিনোপল (Constantinople) এবং ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের (পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য) পতনের পর কনস্টান্টিনোপল কেন্দ্রিক রোমান

সম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলটি পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য তথা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হয়। রোমে বিকাশ লাভ করেছিল রোমান ক্যাথলিক মতবাদ আর কনস্টান্টিনোপলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের দর্শন। তবে ১৪৫৩ সালে উসমানীয়দের হাতে প্রায় এক হাজার বছর স্থায়ী এ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন সম্রাট জাস্টিনিয়ান। জাস্টিনিয়ানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বর্বরদের দ্বারা অধিকৃত পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলো, পুনরুদ্ধারে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, শাসন সংস্কার ও রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে রোমান সাম্রাজ্যের শক্তি ও খ্যাতি অর্জন এবং খ্রিস্ট ধর্ম ও কৃষ্টির প্রসার ঘটানো। তিনি স্বর্ণমুদ্রা চালু করেছিলেন।^৭

রোমান সাম্রাজ্যের ধর্ম: রোমান সমাজে ধর্ম ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। তুলনামূলকভাবে প্রাচীন রোমে ধর্ম বাইরের প্রভাব মুক্ত ছিল। তবে গ্রীক ধর্মের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে তাদের মিল ছিল। রোমানরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবদেবী রূপে কল্পনা করে তাদের পূজা অর্চনা করত। মানুষের মতোই তাদের কার্যকলাপ ছিল আবেগ ও অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক গৃহ ছিল ধর্ম ও দেবদেবীর আখড়া। প্রত্যেক গৃহের একজন তত্তাবধায়ক দেবতা ছিল যাকে জেনাস (Janus) বলা হতো এবং তাকে অত্যন্ত ভক্তি করা হতো। এছাড়াও ভেস্টা (Vesta) ছিল আগুনের দেবতা, জুপিটার আকাশের দেবতা, ভেনাস প্রেমের দেবতা, নেপচুন সাগরের দেবতা, সার্টান ফসলের দেবতা এবং জুনো ছিল গর্ভবতী হওয়ার দেবী। এরা গ্রীক দেবতার মতো প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম সম্পাদন করতো এবং কোন দেবতা সর্বশক্তিমান নয়, প্রত্যেকে ছিল নিজ নিজ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম।

অতীন্দ্রিয়বাদ (Mysticism): অতীন্দ্রিয়বাদ রোমান ধর্মে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রোমান ধর্মের বেশ কিছু উৎসব ছিল আদিম প্রকৃতির। 'Lupercalia' এর সময় পূজারীরা নিজেদের শরীরে ছাগলের রক্ত লেপন করতো এবং সে অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় নৃত্য করতো।

খ্রিষ্টধর্ম: সনাতন ধর্ম রোমান সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু যীশুখ্রিস্টের জন্মের পর রোমে খ্রিস্টান ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। উল্লেখ্য, খ্রিস্ট পূর্ব ৬৩ অব্দে সিরিয়া রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং জুডিয়া করদ রাজ্যে পরিণত হয়। জুডিয়ার অন্তর্গত জেরুজালেমের পাঁচ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বেথলেহেমে যীশুর জন্ম হয়। করতো, তারা জেরুজালেমের অধিবাসীদের চেয়ে খ্রিস্টান ধর্মের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। Gentile'

^৭ ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন, সভ্যতার ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), পৃ. ৩৪২

দের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার জন্যে 'Tarsus' এবং Paul বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পল গীর্জা স্থাপন করেন। এ ধর্মের মতাদর্শের ব্যাখ্যা দিয়ে চিঠি লিখেন এবং বিভিন্ন বক্তৃতার দ্বারা এ ধর্মের প্রচার করেন। (পল খ্রিস্টান ধর্মকে পাপ মোচনের ধর্ম এবং যীশুকে রক্ষা ও উদ্ধারকারী হিসেবে বর্ণনা করেন) খ্রিস্টান ধর্মের সঙ্গে পল জড়িয়ে যাবার ফলে এটা অধিক গতিশীলতা লাভ করে এবং খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষা রোমানদেরকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। রোমাম সম্রাট 'Galerius' দেশে রাজনৈতিক দূর্যোগ ও নিজে মারাত্মক রোগগ্রস্থ হয়ে 'Edict of Toleration' চালু করেন। সম্রাট কনস্টান্টাইন খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে উদার নীতি গ্রহণ করেন এবং খ্রিস্টান ধর্মকে আইন সম্মত ধর্ম বলে স্বীকার করেন। ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিলানের ফরমান (Edict of Milan) দ্বারা উপরোক্ত কার্য সম্পাদন করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতার ফলে কেবল মাত্র রোমে এক বৎসরে বার হাজার লোক ধর্মান্তরিত হন। এমনকি তিনি এবং সম্রাজ্ঞী খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর খ্রিস্টান ধর্মের প্রসার অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে।¹⁰

রোমান দর্শন: রোমান দর্শনের মধ্যে কেবল ল্যাটিন ভাষায় লেখা দর্শনই নয়, প্রজাতন্ত্রের শেষ দিকে এবং রোমান সাম্রাজ্যের গ্রিক ভাষায় লেখা দর্শনও অন্তর্ভুক্ত। গুরুত্বপূর্ণ প্রথম দিকের ল্যাটিন ভাষার লেখকদের মধ্যে রয়েছে লুক্রেটিয়াস, সিসেরো এবং সেনেকা দ্যা ইয়াংগার। দর্শন বিষয়ে লেখার জন্য গ্রীক একটি জনপ্রিয় ভাষা ছিল, এতটাই যে রোমান সম্রাট মার্কস অরেলিয়াস গ্রীক ভাষায় তার ধ্যান লিখতে বেছে নিয়েছিলেন। দর্শনের প্রতি আগ্রহ প্রথম রোমে উত্তেজিত হয়েছিল ১৫৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, একাডেমিক সংশয়বাদী কার্নিয়াডস, ব্যাবিলনপর স্টোইক ডায়োজেনিস এবং পেরিপেটিক ক্রিটোলাসের সমন্বয়ে গঠিত একটি এথেনিয়ান দূতাবাস দ্বারা। রোমান দর্শন হেলেনিস্টিক দর্শন দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল; যাইহোক, দার্শনিক চিন্তাধারার অনন্য বিকাশ রোমান যুগেও ঘটেছিল, অনেক দার্শনিক একাধিক স্কুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে, রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে খ্রিষ্টধর্মের বিস্তারের সাথে সাথে হিপ্পোর সেন্ট অগাস্টিন খ্রিস্টান দর্শন আসে। প্রাচীনকালের শেষ দার্শনিক লেখকদের মধ্যে একজন হলেন বোয়েথিয়াস, যার লেখাগুলি মধ্যযুগের প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক দর্শনের তথ্যের প্রধান উৎস। এই সময়ের মধ্যে এথেন্স চিন্তার একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেছিল যখন

¹⁰ ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন ও অন্যান্য, সভ্যতার ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ), পৃ. ৩৪৯

আলেকজান্দ্রিয়া এবং রোমের মতো নতুন সাইটগুলি বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক আলোচনার আয়োজন করেছিল, যেমন অ্যারিস্টটলের কাজের উপর ভাষ্য।¹¹ রোমান সমাজে ধর্ম, দর্শন অনেকাংশেই গ্রিক ধর্ম ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরে। এছাড়াও স্টোয়িক মতবাদ, এপিকিউরিয়ান মতবাদ, নিওপিথাগোরিয়ানিজম, নিন্দাবাদ, সংশয়বাদ ইত্যাদিও রোমান দর্শন চিন্তাধার অংশ ছিল।

রোমান স্থাপত্য



রোমান সাম্রাজ্যের
মানচিত্র

গ্রিক সভ্যতা: প্রাচীন গ্রিস হলো গ্রিস ইতিহাসের অন্তর্গত প্রাচীন সভ্যতা যা প্রাচীন যুগ খ্রিস্টপূর্ব ৮ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে শুরু হয় এবং ধ্রুপদী সভ্যতা (আনুমানিক ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত বিরাজ করেছিল। এরপর পরই কালটি হচ্ছে প্রারম্ভিক মধ্যযুগ এবং বাইজান্টাইন যুগ। প্রাচীন গ্রিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল ধ্রুপদী গ্রিস যুগ, যা খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ থেকে ৫ম শতাব্দীতে সমৃদ্ধিলাভ করে। ধ্রুপদী গ্রিস শুরু হয় যখন একজন অ্যাথেনীয় নেতৃত্বে পারস্যদের উপদ্রব দমন করা হয়। মহামতি আলেকজান্ডারের বিজয়ের কারণে, হেলেনিস্টিক সভ্যতা মধ্য এশিয়া থেকে ভূমধ্যসাগরের শেষ পশ্চিম পর্যন্ত সমৃদ্ধিলাভ করে। ধ্রুপদী গ্রিস সংস্কৃতি,

¹¹ <https://bn.wikipedia.org>

বিশেষ করে দর্শন, রোমান সাম্রাজ্য উপর একটি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিল, যা ভূমধ্য অঞ্চল এবং ইউরোপে বিভিন্ন অংশে এর একটি সংস্করণের প্রভাব দেখা যায়। যার কারণে ধ্রুপদি গ্রিসেকে সাধারণত আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভিত্তি প্রদান যা দিগন্তকারী সংস্কৃতি বলে মনে করা হয়।¹²



পার্শ্বেনন মন্দির

প্রাচীন গ্রিসের মানচিত্র



অর্থনীতি: খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ থেকে ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত গ্রিসের যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল তা তখনকার সময়ের খুবই উন্নত ছিল। কিছু কিছু ইতিহাসবিদের মতে, এটি ছিল ইন্ডাসট্রিয়াল পূর্ব উন্নত অর্থনীতিগুলোর একটি। এটির ধারণা করা হয় একজন গ্রিক কর্মীর গড় মজুরি দ্বারা যেটি গমের মাপে ছিল ১২ কেজি। রোমান যুগে এটি ছিল ইজিপ্সিয়ানদের তুলনায় ৩ গুন বেশি (তারা পেত ৩.৭৫ কেজি)।

দর্শন: প্রাচীন গ্রিকের দর্শন গুরুত্ব দিত কারণ এবং অনুসন্ধান করার ভূমিকার উপর। অনেকভাবেই এটার বেশ গুরুত্ব আছে বর্তমান দর্শনে, এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানেও। প্রাচীন গ্রিক এবং হেলেনিস্টিক দর্শনবিদ থেকে মধ্যযুগের মুসলিম দর্শনবিদ এবং মুসলিম বিজ্ঞানিরা থেকে ইউরোপের রেনেসা এবং এনলাইটেনমেন্ট থেকে আজকের ঐহিক বিজ্ঞান পর্যন্ত এর পরিষ্কার প্রভাব দেখা যায়।¹³

শিল্প এবং স্থাপত্য: অনেক দেশের শিল্প সংস্কৃতির উপর প্রাচীন গ্রিসের শিল্পের প্রভাব দেখা যায় সেই প্রাচীন সময় থেকে আজ পর্যন্ত, বিশেষত ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য শিল্পে। পশ্চিমের রোমান সাম্রাজ্যের শিল্পের বেশির ভাগই গ্রিসের নমুনায় বা নমুনা থেকে নেয়া। পূর্বের মধ্য এশিয়া, গ্রিক এবং ভারতীয় সংস্কৃতি তৈরী করেছিল গ্রিকো-বুদ্ধিস্ট শিল্প যা জাপান পর্যন্ত যায়। এগুলোর সূচনা হয়েছিল মহান আলেক্সান্ডারের বিজয়ের

¹² <https://bn.wikipedia.org>

¹³ <https://bn.wikipedia.org>

অভিযানের মধ্য দিয়ে। ইউরোপে রেনেসাঁর যুগে ইউরোপিয় শিল্পীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিল গ্রিকদের শিল্প দ্বারা। ঊনবিংশ শতাব্দির মধ্যে সনাতনি ঐতিহ্য যেগুলো পশ্চিমা বিশ্বে তৈরি হয় সেগুলো গ্রিসদের থেকে প্রাপ্ত।

প্রাচীন গ্রীক শিল্প মানবদেহের প্রাকৃতিক কিন্তু আদর্শিক চিত্রের বিকাশের জন্য অন্যান্য সংস্কৃতির থেকে আলাদা, যেখানে মূলত নগ্ন পুরুষের চিত্রই ছিল উদ্ভাবনের কেন্দ্রবিন্দু। প্রায় ৭৫০ এবং ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে শৈলীগত বিকাশের হার প্রাচীন মান অনুসারে উল্লেখযোগ্য ছিল এবং টিকে থাকা কাজগুলিতে ভাস্কর্যের মধ্যে সবচেয়ে ভাল দেখা যায়। পেইন্টিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন ছিল, যেগুলোকে মূলত পুনর্গঠন করতে হয়। আঁকা মৃৎশিল্পে স্বতন্ত্র ক্ষেত্র টি অক্ষত পাওয়া যায়।¹⁴

ধর্ম এবং পুরান: গ্রিক পুরাণ তাদের ঈশ্বর ও হিরোদের গল্প, পৃথিবীর প্রকৃতি এবং উৎপত্তি এবং ধর্ম পালনের গুরুত্ব ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। প্রধান গ্রিক ঈশ্বর ছিল বারটি জিউস, হেরা, পোসাইডন, এরিসা, হারমিস, হেফেসটাস, আফ্রোদিতি, এথেনা, এ্যা পোলো, আর্টেমিস, দেমেতের এবং হেডস। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেব-দেবী হল হেব, হিলিওস, ডিওনিসাস, পারসেফন এবং হারকিউলিস (একজন ডেমি-গড যিনি একই সঙ্গে মানুষ এবং দেবতা) জিউসের পিতা ছিল ক্রোনস এবং মাতা ছিলেন রেয়া(পৌরাণিক চরিত্র)। যারা হেডস, পোসাইডন, হেরা, ডিমিটার এবং হেস্টিয়ার ও পিতা-মাতা ছিলেন।¹⁵

অধ্যায় ২

পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ

¹⁴ <https://bn.wikipedia.org>

¹⁵ <https://bn.wikipedia.org>

পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিচয়: পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বা পশ্চিমা সংস্কৃতি হল সামাজিক নিয়ম, নৈতিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্যগত রীতিনীতি, বিশ্বাস ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, শিল্পকর্ম এবং পশ্চিমা বিশ্বের প্রযুক্তির ঐতিহ্য। এটি পশ্চিমা সভ্যতা, অক্সিডেন্টাল কালচার বা পশ্চিমা সমাজ নামেও পরিচিত। শব্দটি ইউরোপের বাইরের দেশ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের ইতিহাস ইউরোপের সঙ্গে অভিবাসন, উপনিবেশ বা প্রভাব দ্বারা দৃঢ়ভাবে যুক্ত। পশ্চিমা সংস্কৃতি গ্রিকো-রোমান সংস্কৃতি, জার্মানিক সংস্কৃতি ও খ্রিস্টান সংস্কৃতি দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত।¹⁶

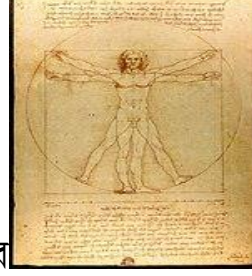
যেভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা গড়ে ওঠেছে:

- **মধ্যে যুগে ইউরোপ:** ইউরোপের ইতিহাসে, মধ্যযুগ বা মধ্যযুগকাল প্রায় 5 ম থেকে 15 শতকের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল, একইভাবে বিশ্ব ইতিহাসের পোস্ট-ক্লাসিক্যাল সময়কালের মতো। এটি পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সাথে শুরু হয়েছিল এবং রেনেসাঁ এবং আবিষ্কারের যুগে রূপান্তরিত হয়েছিল। মধ্যযুগ হল পশ্চিমা ইতিহাসের তিনটি ঐতিহ্যবাহী বিভাগের মধ্যযুগ: শাস্ত্রীয় প্রাচীনতা, মধ্যযুগ এবং আধুনিক সময়কাল। মধ্যযুগীয় সময়টি নিজেই প্রাথমিক, উচ্চ এবং শেষ মধ্যযুগে বিভক্ত। মধ্যযুগের শেষের দিকে দুর্ভিক্ষ, প্লেগ এবং যুদ্ধ সহ বিভিন্ন অসুবিধা এবং বিপর্যয় দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল, যা ইউরোপের জনসংখ্যাকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছিল; 1347 থেকে 1350 সালের মধ্যে, ব্ল্যাক ডেথ প্রায় এক তৃতীয়াংশ ইউরোপীয়কে হত্যা করেছিল। ক্যাথলিক চার্চের মধ্যে বিবাদ, ধর্মদ্রোহীতা এবং পশ্চিমা বিচ্ছিন্নতা রাজ্যগুলিতে সংঘটিত আন্তঃরাজ্য দ্বন্দ্ব, গৃহযুদ্ধ এবং কৃষক বিদ্রোহের সমান্তরাল। সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ইউরোপীয় সমাজকে রূপান্তরিত করেছে, মধ্যযুগের শেষের দিকে এবং আধুনিক যুগের শুরুতে।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস : ১৩ এবং ১৪ শতকের ইতালীয় রেনেসাঁ ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, যখন ইউরোপ প্রাচীন বিশ্বের জ্ঞান অন্বেষণ করছিল এবং অন্ধকার যুগ থেকে বেরিয়ে আসছিল। বিজ্ঞান এবং পরীক্ষার প্রতি নতুন আগ্রহ এবং চার্চ কর্তৃক প্রচারিত পরকালের চেয়ে বর্তমান জীবনের গুরুত্বের উপর মনোযোগ দিয়েছিল রেনেসাঁ। এই সময়টি শিল্পকলা, কবিতা এবং স্থাপত্যে এক বিশাল বিস্ফোরণ

16 <https://www.wikipedia.com>

এনেছিল। নতুন প্রযুক্তি ও শৈলী বিকাশিত হয়েছিল, যা মধ্যযুগের শীতল এবং অন্ধকার শৈলী থেকে সরে আসছিল। এই সময়কে ইউরোপের দীর্ঘকালীন পশ্চাদপদতা থেকে উদ্ধাসিত হওয়া এবং বাণিজ্য ও অন্বেষণের উত্থান হিসেবে দেখা হয়। ইতালীয় রেনেসাঁ প্রায়শই "আধুনিক" যুগের সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।



লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা ভিক্রভিয়ানো মানব

তবে, মধ্যযুগে যে অসংখ্য আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলির শিকড় ছিল, যেমন জাতি-রাষ্ট্র, সংসদ, সীমিত সরকার, প্রশাসনিক কাঠামো, এবং পণ্য ও পরিষেবার নিয়ন্ত্রণ, সেগুলিকে স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্ম সংস্কার আন্দোলন: খ্রিস্টধর্মের প্রতিবাদপন্থী সংস্কার

আন্দোলন ([ইংরেজি](#): Reformation), যাকে প্রোটেষ্টান্ট সংস্কার-আন্দোলন (Protestant Reformation) নামেও ডাকা হয়, পশ্চিমা বিশ্বের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যকার একটি বিভাজনমূলক (Schism) আন্দোলনকে বোঝায়। ১৬শ শতকে ইউরোপ মহাদেশে জার্মান ধর্মযাজক [মার্টিন লুথার](#) (Martin Luther) আন্দোলনটির সূচনা করেন এবং পরবর্তীতে সুইস যাজক [জন কালভাঁ](#) (John Calvin), [হলড্রিখ জুইংলি](#) (Huldrych Zwingli) এবং অন্যান্য অগ্রবর্তী [প্রোটেষ্টান্ট সংস্কার-আন্দোলনকারীরা](#) এটি অব্যাহত রাখেন। ধারণা করা হয় যে ১৫১৭ সালে লুথারের রচিত [পঁচানব্বইটি বিবৃতি](#)-র প্রকাশনার মাধ্যমে এই আন্দোলনের সূচনা। [ত্রিশ বছরের যুদ্ধের](#) শেষে [ওয়েস্টফালিয়া শান্তিচুক্তি](#) সম্পাদনের মাধ্যমে ১৬৪৮ সালে এর সমাপ্তি ঘটে।

মার্টিন লুথারের আগেও অনেকে [ক্যাথলিক মণ্ডলীর](#) কর্মকাণ্ড সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে [ইয়ান হুস](#), [পেটার ভালডো](#) এবং [জন ওয়াইক্লিফ](#) উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বেশিরভাগের মতে মার্টিন লুথারই তাঁর প্রকাশনার মাধ্যমে এই আন্দোলনটির অবতারণা করেন। মার্টিন লুথার তাঁর গ্রন্থে [প্রশ্রয়ের](#) (indulgence) বিক্রির সমালোচনা করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে মৃত্যু-পরবর্তী [প্রায়শ্চিত্তমূলক অবস্থার](#) (purgatory) উপরে পোপের কোনই কর্তৃত্ব নেই। তিনি আরও বলেন যে ভবিষ্যতে ব্যবহার্য পুণ্যের

ভাণ্ডারের (Treasury of Merit) যে মতবাদ (doctrine) ক্যাথলিক মণ্ডলী প্রচার করে, খ্রিস্টানদের মূল ধর্মগ্রন্থ [বাইবেলে](#) তার কোনো ভিত্তি নেই।

একাধিক পোপের মধ্যে দ্বন্দ্ব (Western Schism), রোমের ক্যাথলিক মণ্ডলী ব্যবস্থার দুর্নীতি, জাতীয়তাবাদ ও মানবতাবাদের উত্থান এবং রেনেসাঁস পর্বে লব্ধ নতুন নতুন জ্ঞান, ইত্যাদি এই সংস্কার-আন্দোলনের চালিকাশক্তি হলেও মূল কারণ ছিল খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিক।

প্রথমে জার্মানিতে শুরু হলেও গুটেনবের্গের ছাপাখানার বদৌলতে সারা ইউরোপে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এদের মধ্যে লুথারবাদী এবং কালভাঁবাদীরা ছিল সবচেয়ে বড় দুইটি দল। লুথারীয় মণ্ডলীগুলি মূলত জার্মানি, বাল্টিক অঞ্চল ও স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে কালভাঁবাদী মণ্ডলীগুলি [সুইজারল্যান্ড](#), হাঙ্গেরি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস ও স্কটল্যান্ডে প্রতিষ্ঠালাভ করে। ১৫৪৭ সালে আন্দোলনটি ইংল্যান্ডের মণ্ডলীকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

ক্যাথলিক মণ্ডলী এই আন্দোলনের প্রত্যুত্তরে [খ্রিস্টধর্মের প্রতি-সংস্কার-আন্দোলন](#) শুরু করে। জেসুইট সম্প্রদায় প্রতিবাদী মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অনেক কাজ করে। আন্দোলনের শেষে আয়ারল্যান্ড বাদে গোটা [উত্তর ইউরোপ](#) প্রতিবাদী মতবাদের অধীনে চলে আসে। [দক্ষিণ ইউরোপ](#) ক্যাথলিক থেকে যায়। মধ্য ইউরোপে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং ত্রিশ বছরের যুদ্ধ শেষে অঞ্চলটি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

প্রতিসংস্কার আন্দোলন: ষোড়শ শতকে ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রচারণা শ্লথ করার জন্য এবং ক্যাথলিক গির্জার সংস্কার ও ধর্মাধিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার জন্য প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাকে প্রতিসংস্কার আন্দোলন বলা হয়। ক্যাথলিক চার্চের যাজকদের আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করে ক্যাথলিক ধর্মকে পুনরায় মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার জন্য এ আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। লুথারীয় প্রোটেস্ট্যান্টবাদের প্রচারে ভীত হয়ে যেসব স্পষ্ট ক্রটি ও অনিয়ম রোমান গির্জার ক্ষমতা নষ্ট করেছিল, সেগুলো দূরীভূত করার জন্য কতগুলো সংস্কার পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছিল। এদিক থেকে বিবেচনা করলে প্রতিসংস্কার আন্দোলনকে ক্যাথলিক চার্চের পুনর্গঠন আন্দোলনও বলা যেতে পারে। জেসুইট সংঘ (The Society of the Jesuits) প্রতিসংস্কার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইগ্নেশিয়াস লায়লা। ১৪৯১ সালে স্পেনের গুইপুজকোয়াতে ইগ্নেশিয়াস লায়লা জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে সেনাবাহিনীতে চাকরি

নিয়েছিলেন। একটি যুদ্ধে কামানের গোলা লেগে তার একটি পা নষ্ট হয়। তিনি বহুদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় বীরত্ব সম্বলিত সাহিত্য পড়তেন। তিনি লুডলফ স্যাকসোনির ‘লাইফ অফ ক্রাইস্ট’ ও ‘ফ্লাওয়ারস অব দ্য সেইন্টস’ পাঠ করে এক নতুন জীবনের সন্ধান পান। সুস্থ হয়ে তিনি খ্রিস্টধর্মের সেবায় আত্মনিয়োগের পরিকল্পনা করেন। গৃহত্যাগ করে তিনি মোন্টসেরাট মঠে রক্ষিত কুমারী মেরির মূর্তি দেখতে পান এরপর তিনি মানরেসার বাইরে একটি গুহায় অবস্থান করেন। এখানে তিনি নয় মাস কাটান। এ সময়ের শেষের দিকে তিনি ঈশ্বর ত্রিত্বের দর্শন পান। এটি তার সংবেদনশীল মনে গভীর দাগ কাটে। জীবনের প্রথম দিকে তার জীবনধারা ছিল কঠোরতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু তিনি কখনো সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেননি। পরে তিনি মধ্যপন্থা গ্রহণ করেন। অন্যের আত্মাকে সাহায্য করা এবং ধর্মকর্ম ফলপ্রসূ হওয়ায় তিনি এ সময় থেকে কঠোরতা পরিত্যাগ করেন। ইয়েশিয়াস লায়লা স্পিরিচুয়াল এক্সারসাইজেস নামে একটি গ্রন্থ রচনা ইশিয়া করেন। এটি ১৫৪৮ সালে তা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ধর্মে বিশ্বাসী লোকের জন্য একটি ভক্তি ও প্রশিক্ষণের গ্রন্থ। ধ্যানের প্রথম সপ্তাহে মানুষের মন নিষ্ক্রিয় হয়, তবে দ্বিতীয় সপ্তাহে সে সৃষ্টিকর্তা ও তার কাজে আত্মনিয়োগ করার গৌরব অনুভব করে। তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে সে যিশুর জীবন ও অনুভূতি এবং মানুষের পাপের গভীরতা নিয়ে ধ্যান করে। শেষে সে স্বর্গের আনন্দ পায়। এজন্য সে তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পরিত্যাগ করে। ১৫২৩ সালে ইয়েশিয়াস লায়লা মানরেসা থেকে জেরুজালেমে যান সেখান থেকে যান রোমে ও ভেনিসে এবং শেষে বাসিলোনায়ে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি উচ্চতর ডিগ্রি নেন এবং সেখানেই সোসাইটি অফ জেসাসের গঠন প্রক্রিয়া আরম্ভ করেন। ১৫৩৪ সালে তার ছয় অনুসারী এবং তিনি বিধর্মীদেরকে ধর্মান্তরিত করতে বা পক্ষে সাহায্য করতে জেরুজালেমে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সেন্টডেনিস চ্যাপেলে দারিদ্র ও কৌমার্যের শপথ গ্রহণ করেন। ইয়েশিয়াস লায়লা যিশুর জন্যভূমি জেরুজালেমে যাওয়ার জন্য নৌকার জন্যে ভেনিসে যান।¹⁷

এনলাইটেনমেন্ট: আলোকিত যুগ হলো সপ্তদশ শতাব্দীর [ইউরোপের](#) একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন যার প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল ব্যক্তিস্বকীয়তা, মানব স্বাধীনতা, [যুক্তিবাদের](#) প্রতিষ্ঠা ও মানব ঐতিহ্য।^[১] এই বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল [বিজ্ঞান](#) ও [সাহিত্য](#) চর্চার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান বিকশিত করে প্রথাগত বিশ্বাস ও কুসংস্কারের শাসন থেকে মানুষকে মুক্ত করে সমাজকে মানবিকতার পথে পরিচালিত করা। এই আন্দোলন মানুষকে বিজ্ঞান চিন্তা, সংশয়বাদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শনের চর্চায়

¹⁷ www.bibortan.com

উদ্ধৃত করে।^[২] এই আন্দোলনের পূর্বে সমাজে সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হত সমাজের ধনিক শ্রেণি ও প্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রদর্শিত সংস্কৃতি ও অভিপ্রায় অনুযায়ী। তবে মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম সংঘটিত এই দার্শনিক বিপ্লব মানুষের সমাজব্যবস্থার জন্য কিছু মূলনীতির জন্ম দেয় যেগুলো হলো কোন বিষয় সম্পর্কে উপসংহারে আসার জন্য সঠিক যুক্তি ব্যবহার করা, যুক্তিগুলো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে ঝালিয়ে নেওয়া এবং পুনরায় প্রমাণের আলোকে মূলনীতিগুলো পর্যালোচনা করা।

আলোকিত দার্শনিকরা সমাজের অসহিষ্ণুতা ও কুসংস্কারের বিপক্ষে ছিলেন। তৎকালীন যুগে কিছু স্বৈরশাসক আলোকিত যুগের দর্শন, শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থার সমন্বয়ে আলোকিত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে আলোকিত যুগের মূলনীতিগুলো সমাজে ও সরকার ব্যবস্থায় জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বলা বাহুল্য শত প্রচেষ্টার পরেও আলোকিত দর্শন নিয়ে এ ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা সফলতার মুখ দেখে নি। তবে এ ধরনের পদক্ষেপগুলো পরবর্তিতে সমাজে পরিবর্তন আনতে সহায়তা করেছে। আলোকিত যুগের চিন্তাগুলো পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

২.৩ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন দিক

২.৩.১ বিশ্বাস: পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলত ‘তাত্ত্বিক মতাদর্শ’, যা ইউরোপ ও আমেরিকার সমসাময়িক পশ্চিমাদের মধ্যে বিরাজমান। এই মতাদর্শ বলতে আমরা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণভিত্তিক ‘বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ’কেই বোঝাই না; বরং আমরা সেই দার্শনিক মতাদর্শের কথা বলছি, যা ধর্ম ও জীবন, দুনিয়া ও মানুষ, জ্ঞান ও মূল্যবোধের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করে। এ মতাদর্শের সঙ্গে আরো সম্পৃক্ত আছে মেটাফিজিক্যাল দর্শন, নানা ধরনের শিক্ষায়তন সমৃদ্ধ নৈতিক দর্শন এবং বিভিন্ন শাখা ও আদর্শসমৃদ্ধ সামাজিক দর্শন। পাশ্চাত্য মতাদর্শ উদারনৈতিক বা সামাজিক, পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী যা-ই হোক না কেন, এটি মূলত সব মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের দিক থেকে পুরোপুরি পশ্চিমা, যদিও এর শাখা-প্রশাখায় ভিন্নতা আছে। তাদের বুশ্বাসসমূহের অন্যতম বিশ্বাসগুলো হলো-

- স্যাকুলারিজম
- ফেমিনিজম
- লিবারেলিজম
- গণতন্ত্র

• সমাজতন্ত্র ইত্যাদি

২.৩.২ পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রব্যবস্থা: পাশ্চাত্য সভ্যতার রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ভিত্তি স্যাকুলারিজম। স্যাকুলারিজমে বিশ্বাস করা হয় রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকে না। তাই রাষ্ট্র দর্ম দ্বারা পরিচালিত হওয়ার দরকার নেই। তবে রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করেন তারা কোনো না কোনো ধর্মের অসরণ করে থাকে। তাই ধর্মহীন রাষ্ট্র পরিচালনা করা যুক্তিসংগত নয়। এছাড়াও গণতন্ত্র হলো তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম ব্যবস্থা। এতে জনগনকে সার্বভৌমত্বের অধিকার মনে করা হয়। অথচ ইসলাম বলে, আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক

২.৩.৩ পাশ্চাত্যের অর্থব্যবস্থা: পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ পশ্চিমা অর্থব্যবস্থার হাতিয়ার। পুঁজিবাদে ব্যক্তির মালিকা স্বীকার করা হলেও, সাম্যবাদে সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা মনে করা হয়। পুঁজিবাদে ধীনে আরও ধনী হয়। ফলে গরিব আরও গরিব হয়। অন্যদিক সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানা না থাকায় সম্পদের যথাযথ উৎপাদন করা হয় না।

২.৩.৪ পশ্চিমায় নারীর অধিকার:

বর্তমান বিশ্বেও নারীর যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হ'তে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ঘরছাড়া করেছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদার যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল, পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুণ্ণ করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শৃংখলে বন্দী করে ফেলেছে।

পাশ্চাত্যবাদীরা পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে নারীদেরকে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে গড়ে তুলছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও ৮৫% নারী ধনতন্ত্রবাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদেরকে অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারের পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করছে এবং খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। যেমন- নারীদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, নারী বিষয়ক নানান অশ্লীল গল্প, কবিতা, উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যুব সমাজ এমনকি বৃদ্ধদেরও মানসিক বিকৃতি ঘটছে। এভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নীচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারী জাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অধ্যায় ৩

ইসলামী সভ্যতার স্বরূপ

৩.১ ইসলামি সভ্যতা: ইসলামের ইতিহাস হলো ইসলামি সভ্যতার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাস। ইসলামি সভ্যতা সপ্তম শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপে উৎপত্তি লাভ করে এবং পরবর্তীতে বিশ্বের অনেক অংশে ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ বিশ্বাস করেন যে ইসলামের উৎপত্তি মক্কা ও মদিনায় সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে মুহাম্মাদ এর মাধ্যমে। মুহাম্মাদ হলেন ইসলামের নবী। তিনি মক্কায়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে প্রথম ওহী লাভ করেন। তিনি মক্কা ও

মদিনায় তার ধর্মপ্রচার শুরু করেন, যেখানে তিনি ইসলামের শিক্ষা প্রচার করেন। মুসলিমরা এই সময়কে ইব্রাহিমীয় নবীদের দ্বারা প্রেরিত মূল ধর্মে ফিরে আসার সময় হিসাবে বিবেচনা করে। ইব্রাহিমীয় নবী হলেন আদম, নূহ, ইব্রাহিম, মুসা, দাউদ, সুলায়মান এবং ঈসা। মুসলিমরা বিশ্বাস করেন যে এই নবীরা সকলেই একই ঈশ্বরের কাছ থেকে বাণী পেয়েছিলেন। উপনিবেশগুলোতে, ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাদের নিজস্ব আইন, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি প্রবর্তন করে। দুই শতাব্দী ধরে, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ ইউরোপীয় শক্তির অধীনে থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়াই করেছে। এই লড়াইগুলোর কিছু এখনও চলমান রয়েছে এবং অনেক মুসলিম দেশ এখনও স্বাধীনতা অর্জন করেনি। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও সংঘাত চলছে। এই সংঘাতগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসরায়েলি-ফিলিস্তিনি সংঘাত, কাশ্মীর সমস্যা, উইঘুর মুসলিম নিধন, মধ্য আফ্রিকান সংঘাত, বসনিয়া যুদ্ধ এবং মিয়ানমারের রোহিঙ্গা গণহত্যা। ১৯৭০-এর দশকে, তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিলের আরব রাষ্ট্রগুলোর (বিশেষ করে বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত) অর্থনীতি বিকশিত হয়। এই তেল-সমৃদ্ধ দেশগুলো এখন বিশ্বের বৃহত্তম তেল উৎপাদক এবং রপ্তানিকারক। গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিলের আরব রাষ্ট্রগুলো পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তারা মুক্ত বাণিজ্য এবং পর্যটনকে উৎসাহিত করেছে।

3.2 ইসলামী সভ্যতার বিভিন্ন দিক

৩.২.১ বিশ্বাস/আকিদা: বিশ্বাস বা ধর্মবিশ্বাস বুঝাতে মুসলিম সমাজে সাধারণত দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়: ‘ঈমান’ ও ‘আকীদা’। কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফে সর্বদা ‘ঈমান’ শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। ‘আকীদা’ বা অন্য কোনো শব্দ কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবীগণের যুগে ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে ‘ধর্ম-বিশ্বাস’ বুঝাতে আরো কিছু পরিভাষা এ বিষয়ে পরিচিতি লাভ করে। মানুষ যা সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং যাকে সে দীন হিসাবে গ্রহণ করে তাই তার আকীদা। এ আকীদাটি যদি আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত রসূলগণের দীন এবং তার নাযিলকৃত কিতাবসমূহ অনুযায়ী হয়, তাহলে তা সহীহ আকীদা হিসাবে গণ্য হয়। তার মাধ্যমে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্য লাভ করা যাবে।

আর এ আকীদা যদি আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত রসূলগণের আনীত আকীদার বিরোধী হয় এবং তার নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহের পরিপন্থী হয়, তাহলে তার অনুসারীরা আযাবের সম্মুখীন হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে হতভাগ্য হবে। কেউ পরিশুদ্ধ আকীদা গ্রহণ করলে দুনিয়াতে তার জান-মাল নিরাপদ থাকবে এবং অন্যায়ভাবে তার উপর আক্রমণ করা নিষিদ্ধ হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ مَالَهُ وَدَمَهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ
 “যে ব্যক্তি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য বাতিল মাবুদের
 ইবাদতকে অস্বীকার করবে, তার জান-মাল মুসলিমদের নিকট সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে এবং
 তার অন্তরে লুকায়িত বিষয়ের হিসাব আল্লাহর উপরই ন্যস্ত হবে”। এ পরিশুদ্ধ আকীদাই
 কিয়ামতের দিন বান্দাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাবে। মুসলিম শরীফে জাবের
 রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
 বলেছেন,

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ
 “যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যু বরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ
 করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যু বরণ করবে সে জাহান্নামে
 প্রবেশ করবে”।

৩.২.২ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা/খিলাফত: খিলাফত (আরবি: خلافة khilāfa, উত্তরাধিকার) হল
 ইসলামি সরকার ব্যবস্থা, যা মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক একতার প্রতিনিধিত্ব
 করে। যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকারী। এই ধরনের শাসন
 ব্যবস্থার কে ‘খলিফা’ বলা হয় এবং খিলাফার প্রধান কে খালিফা বলা হয়।

খলিফা (আরবি: خليفة, বাংলা:প্রতিনিধি) শব্দটির আভিধানিক অর্থ উত্তরাধিকারী,
 প্রতিনিধিত্বকারী, স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি, কর্মাধ্যক্ষ, জনসমষ্টির দেখাশোনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি।
 ইসলামি পরিভাষায় খলিফা হলেন এমন ব্যক্তি যিনি যাবতীয় বিষয়ে শরিয়ত অনুযায়ী সমস্ত
 উম্মতকে পরিচালিত করেন। ইসলামি রাষ্ট্রে খলিফা সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি
 রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে গভর্নর, শাসক, নেতা, কাজি নিযুক্ত করেন।

খলিফা হওয়ার শর্তাবলি

শর্তগুলোর প্রধান কয়েকটি হলো:

মুসলিম হওয়া

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া

পুরুষ হওয়া

স্বাধীন হওয়া

ন্যায়পরায়ণ হওয়া

বিবেকসম্পন্ন হওয়া

জ্ঞান (ইলম) থাকা

উম্মাহ দরদী ও কাফেরদের সাথে আপোষহীন।

3.2.3 ইসলামী অর্থনীতি (আরবি : الاقتصاد الإسلامي) অর্থশাস্ত্র বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রক্রিয়ার জ্ঞানকে বোঝায় ইসলামী নীতি ও শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে। ব্যক্তি ও সামাজিক অর্থনৈতিক আচরণ সম্পর্কে ইসলামের একটি নির্দিষ্ট নৈতিক নিয়ম ও মূল্যবোধ রয়েছে। অতএব, এর নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে, যা তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে এবং মানব আচরণের অন্যান্য দিকগুলির ইসলামী সংগঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। ইসলামী অর্থনীতি হল একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র, যা ইসলামী বাণিজ্যিক আইনশাস্ত্রের (আরবি : فقه المعاملات , ফিকহ আল-মুআমালাত) এর আরও নির্দিষ্ট উপসেটের সাথে সম্পর্কিত। এটি মূল্যের শ্রম তত্ত্বের অনুরূপ অর্থনীতির একটি আদর্শও, যা "শ্রম-ভিত্তিক বিনিময় এবং বিনিময়-ভিত্তিক শ্রম" উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও, ইসলামী অর্থনীতি এখনও বিষয়ভিত্তিক তত্ত্বের চেয়ে শ্রম তত্ত্বের কাছাকাছি থাকে। ইসলামী বাণিজ্যিক আইনশাস্ত্রে অর্থ লেনদেন বা অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপের নিয়মগুলিকে শরীয়া অনুগত পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করে, অর্থাৎ, ইসলামী ধর্মগ্রন্থ (কুরআন ও সুন্নাহ) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পদ্ধতি। ইসলামী আইনশাস্ত্র (ফিকাহ) ঐতিহ্যগতভাবে কোনটি প্রয়োজনীয়, নিষিদ্ধ, উৎসাহিত, নিরুৎসাহিত বা জায়েজ তা নির্ধারণ করে। আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী (কুরআন) এবং মুহাম্মদ (সুন্নাহ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী। এটি সম্পত্তি, অর্থ, কর্মসংস্থান, ট্যাক্স, ঋণ, অন্যান্য সবকিছুর মতো বিষয়গুলিতে প্রযোজ্য। অন্যদিকে অর্থনীতির সামাজিক বিজ্ঞান, পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন, বন্টন এবং ব্যবহার বর্ণনা, বিশ্লেষণ এবং বোঝার জন্য কাজ করে, এবং, কীভাবে সর্বোত্তম নীতির লক্ষ্য অর্জন করা যায়, যেমন পূর্ণ কর্মসংস্থান, মূল্য স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক ইকুইটি এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

3.2.4 ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

মর্যাদা অর্থ- গৌরব, সম্মান, মূল্য ইত্যাদি। আর নারীর মর্যাদা বলতে নারীর ন্যায্য-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়। আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান করা। আর এ প্রাপ্য বা পাওনা বলতে তার অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক জীবনে তার অবদানের যথার্থ মূল্যায়নই বুঝানো হয়। সুতরাং নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়। অতএব যদি কারো ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করা হয়, অথবা তার কর্তব্যে বাধা দান বা তার সামর্থ্যের অধিক কোন দায়িত্ব-কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা তার অবদান সমূহের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয়, তাহলে তার অধিকার

ও মর্যাদা খর্ব করা হবে এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যখন তার অধিকার সমূহ স্বীকার করা হয়, তার সামর্থ্য অনুসারে তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এবং সামাজিক জীবনে তার অবদান সমূহের মূল্যায়ন করা হয়, তখন তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান :

ইসলাম পূর্ব যুগে নারী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত, লাঞ্চিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত এবং অধিকার হারা জাতি। সে সময় নারীকে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বাজারের পণ্য হিসাবে গণ্য করা হ'ত। সেই সময়ে নারীদেরকে মানুষ হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হ'ত না এবং তাদের কোন সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এমনকি মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও ছিল না। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হ'ত। সে যুগে নারীদেরকে মনে করা হ'ত দাসী এবং ভারবাহী পশু হিসাবে। যাদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হ'ত। সে আমলে স্বামী যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করত এবং ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অপরের কাছে বিক্রি করে দিতে পারত কিংবা স্ত্রীকে দিয়েই কেউ ঋণ পরিশোধ করত। আবার কেউ উপহার হিসাবে কাউকে এমনিই দিয়ে দিত। তারা কন্যা সন্তান জন্মকে লজ্জাজনক মনে করে স্বীয় নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও কুণ্ঠিত হ'ত না। তাদের এমন বিবেক বর্জিত কর্ম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ‘আর যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?’ (তাকভীর ৮-৯)। সেযুগে তারা পিতা-মাতা বা স্বামীর মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হ'ত। পিতৃহীনা সুন্দরী-ধনবতী বালিকার অভিভাবক যথাযথ মোহর দানে তাকে বিবাহ করতে সম্মত হ'ত না। আবার অন্যত্র বিবাহ দিতেও অসম্মতি প্রকাশ করত। সুন্দরী বাঁদী দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করা হ'ত। এ গর্হিত কাজ হ'তে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, وَلَا تَكْرَهُوا فَنِّيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ‘আর তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে তোমাদের যুবতী দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'তে বাধ্য করবে না। যখন তারা পাপমুক্ত থাকতে চায়’ (নূর ৩৩)। উল্লিখিত যুগে একের অধিক নারী বিবাহ করে তাদের ন্যায্য পাওনা হ'তে বঞ্চিত করা হ'ত। তাদেরকে তালাক দিয়ে অন্যত্র স্বামী গ্রহণের অবকাশও দেওয়া হ'ত না। এ জাতীয় অমানবিক ও অমানুষিক যুলুম অত্যাচার নারী জাতির উপর করা হ'ত।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা :

মানব সৃষ্টির প্রথম দিকে আল্লাহ তা‘আলা আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সহধর্মিনী হিসাবে তাঁরই বাম পাঁজরের একটি হাড় হ’তে আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-কে সৃজন করেন। অতঃপর তাঁদের হ’তে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ** ‘হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হ’তে সৃষ্টি করেছি’ (হুজুরাত ১৩)।

মহান আল্লাহ এ বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলুকাতে মধ্য মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

‘আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি। আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি’ (বনী ইসরাঈল ৭০)।

আল্লাহ তা‘আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, **وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ** ‘স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে’ (বাক্বারাহ ২২৮)। ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতঃ নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হ’ল-

ক) বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন,

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

‘তবে যেসব নারী তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না। তাহ’লে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ কর। অবিচার হ’তে বাঁচার জন্য এটাই অধিক সঠিক কাজ’ (নিসা ৩)।

(খ) স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পসন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ'ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ'তে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ 'হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না' (বাক্বারাহ ২৩২)।

অধ্যায় ৪: ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব

৪.১ ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দের কারণ:

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দের মূল কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. বিশ্বাস ও আদর্শের পার্থক্য

পাশ্চাত্য সভ্যতা: এটি প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষতাকে গুরুত্ব দেয়। এখানে ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে গণ্য হয়, এবং জীবনযাপনের নিয়ম-কানুন গড়ে ওঠে মানবসৃষ্ট আইন, যুক্তি ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে।

ইসলামী সভ্যতা: ইসলামে জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মীয় নিয়ম-কানুন ও শরীয়াহর অনুসরণ বাধ্যতামূলক। এখানে ধর্ম ও জীবন আলাদা নয়।

২. নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পার্থক্য

পাশ্চাত্য সভ্যতায় ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং ব্যক্তির পছন্দের ওপর জোর দেওয়া হয়। এই মূল্যবোধ অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের সামাজিক এবং নৈতিক বিধানগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। ইসলামী সভ্যতায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো মেনে চলে।

৩. ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মীয় কর্তৃত্ব

পাশ্চাত্য সমাজ ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, যেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা। ইসলামে রাষ্ট্র ও ধর্ম অভিন্ন। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামো ধর্মীয় আদর্শের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়।

৪. শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা

পাশ্চাত্য সভ্যতায় শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার প্রধান ভিত্তি হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, গবেষণা এবং মানবীয় যুক্তি। ইসলামী সভ্যতায় জ্ঞানচর্চার প্রধান উৎস হলো কুরআন ও হাদিস। তবে ইসলামী সভ্যতা প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞান ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, যা ঈমান ও আমলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৫. সংস্কৃতি ও জীবনধারা

পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে পোশাক, খাদ্যাভ্যাস এবং বিনোদনে উদারপন্থা লক্ষ্যণীয়। ইসলামী সংস্কৃতিতে জীবনযাত্রা ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত। উদাহরণস্বরূপ, পোশাকে পর্দা, খাদ্যে হালাল এবং বিনোদনে সীমারেখা মেনে চলা।

৬. রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব

ক্রুসেড থেকে শুরু করে উপনিবেশবাদ পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা পশ্চিমা ও ইসলামী বিশ্বের মধ্যে দ্বন্দ্বের পটভূমি সৃষ্টি করেছে। আধুনিক যুগে সম্ভ্রাসবাদ ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এই সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলেছে।

এই দ্বন্দ্ব মূলত আদর্শিক, সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক পার্থক্য থেকে উদ্ভূত। তবে সংলাপ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার মাধ্যমে এই দ্বন্দ্বের নিরসন সম্ভব।

৪.২ মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব:

মুসলিম বিশ্বে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব একটি জটিল ও বহুমাত্রিক বিষয়। এই দ্বন্দ্বের পেছনে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান।

মিশরে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল বিষয়। এই দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বহুদিন ধরে বিদ্যমান।

১. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মিশর একটি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র হলেও ইসলামিক খিলাফতের অধীনে আসার পর থেকে এটি ইসলামী সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে

মিশর দীর্ঘ সময় ধরে ইসলামী শাসনের আওতায় ছিল। তবে ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসনের ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে মিশরের সরাসরি যোগাযোগ বাড়ে।

২. পাশ্চাত্য আধুনিকতা বনাম ইসলামী ঐতিহ্য

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুরুর দিকে পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মিশরে প্রবেশ করতে থাকে। অনেক মিশরীয় এই আধুনিকতার সুযোগ গ্রহণ করতে চাইলেও অন্য একটি অংশ এই পরিবর্তনকে ইসলামী ঐতিহ্যের ওপর আঘাত হিসেবে দেখেছে। এই প্রেক্ষাপটে দ্বন্দ্বটি মূলত তিনটি ক্ষেত্রে দেখা যায়:

শিক্ষা ও সংস্কৃতি: পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক বিজ্ঞান এবং মানবতাবাদী চিন্তাভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে এলেও, এটি ইসলামিক মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে সংঘর্ষে আসে। অনেকেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং ইসলামের মূল্যবোধের পরিপন্থী বলে মনে করতেন।

ভারতবর্ষে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব

ভারতবর্ষে ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব একটি জটিল এবং বহুমুখী ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফসল। এই দ্বন্দ্ব ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান ছিল এবং তা আজও দেখা যায়। এটি মূলত তিনটি প্রধান যুগে স্পষ্টভাবে দেখা যায়: মধ্যযুগে ইসলামিক শাসন, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন, এবং আধুনিক ভারতবর্ষে।

১. মধ্যযুগে ইসলামিক শাসন ও স্থানীয় সমাজব্যবস্থা

মধ্যযুগে ভারতবর্ষে ইসলামিক শাসকদের আগমন ঘটে (তুর্কি, আফগান ও মুঘলদের মাধ্যমে)। ইসলাম তখন স্থানীয় হিন্দু, বৌদ্ধ, ও জৈন ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি বিশেষ ধরনের ভারতীয় ইসলামিক সংস্কৃতি গড়ে তোলে। ধর্মীয় দ্বন্দ্ব: ইসলাম প্রচারিত একেশ্বরবাদ এবং হিন্দু ধর্মের বহুদেবতাবাদী বিশ্বাসের মধ্যে একটি তাত্ত্বিক সংঘর্ষ ছিল। তবে বিভিন্ন সুফি সাধকরা ধর্মীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চেষ্টা করেন। সামাজিক কাঠামো: ইসলামের সমতা ও ভ্রাতৃত্ববাদের আদর্শ স্থানীয় জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

২. ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব

১৮৫৮ সালে ভারত সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের অধীনে এলে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব গভীরতর হয়। এই সময় ইসলামী সমাজ এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে একটি নতুন ধরনের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পশ্চিমা শিক্ষা ও সংস্কৃতি: ব্রিটিশরা ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করলে অনেক ভারতীয় মুসলিম ও হিন্দু শিক্ষার্থীরা তা গ্রহণ করলেও অনেক মুসলিম আলেম এবং বিদ্বান এটিকে ইসলামী ঐতিহ্যের জন্য হুমকি হিসেবে দেখেন। বিশেষ করে সৈয়দ আহমদ খান মুসলিমদের আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আলিগড় আন্দোলন শুরু করেন, কিন্তু এটি মুসলিম সমাজের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি তৈরি করে। ধর্মীয় পুনর্জাগরণ: এই সময় ভারতের মুসলিম সমাজে দেওবন্দ আন্দোলন এবং ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য সমাজের মতো হিন্দু

ধর্মীয় পুনর্জাগরণ আন্দোলন শুরু হয়। দেওবন্দ আন্দোলন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ইসলামী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন চেয়েছিল।

রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব: ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতীয় মুসলিমরা দ্বিধায় ছিলেন। কিছু মুসলিম ব্রিটিশদের সহযোগিতা করলেও অন্যরা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেন। পরে মুসলিম লীগ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিপরীতে পাকিস্তানের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের দাবি তোলে।

৩. আধুনিক যুগে দ্বন্দ্ব

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতেও ইসলাম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকে।
 ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মীয় পরিচয়: স্বাধীন ভারতের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলেও ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের মাঝে কিছু সংঘাত রয়ে গেছে। পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা ও আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষার দ্বন্দ্ব এখানেও দৃশ্যমান।
 সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব: পশ্চিমা জীবনধারা, পোশাক, নারীর অধিকার ইত্যাদি নিয়ে মুসলিম সমাজে অভ্যন্তরীণ বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। মৌলবাদের উত্থান এবং পাশ্চাত্য প্রভাবকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা ইসলামি সমাজে নতুন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। রাজনীতি ও আইন: মুসলিম পার্সোনাল ল এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে বিতর্ক এই দ্বন্দ্বের একটি আধুনিক উদাহরণ। মুসলিম সমাজ একদিকে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় আইন মেনে চলার স্বাধীনতা চায়, অন্যদিকে ভারতীয় রাষ্ট্র সর্বজনীন নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে চায় ভারতবর্ষে ইসলাম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব মূলত ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মধ্যে সংঘর্ষের প্রতিফলন। এই দ্বন্দ্ব কখনো সংঘাতময় হলেও, ভারতীয় সমাজে বহু সংস্কৃতি ও বহু ধর্মের সহাবস্থানের ফলে একটি অনন্য সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তৈরি হয়েছে। আজকের ভারতবর্ষে এই দ্বন্দ্ব সমন্বয় ও সম্প্রীতির পথে সমাধান খোঁজার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলো কেনো পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করছে?

মুসলিম রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন কারণে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে। এর পেছনে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সামাজিক বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে:

১. ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব

ঔপনিবেশিক যুগে ইউরোপীয় শক্তিগুলো (যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স) মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওপর শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ সময় পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা, আইন, এবং প্রশাসনিক কাঠামো মুসলিম সমাজে প্রবর্তিত হয়। ফলে পশ্চিমা মূল্যবোধ এবং জীবনধারা ধীরে ধীরে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

২. শিক্ষা ও প্রযুক্তির উন্নতি

পশ্চিমা দেশগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছিল, যা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জন্য আকর্ষণীয় ছিল। অনেক মুসলিম দেশ নিজেদের উন্নতির জন্য পশ্চিমা শিক্ষা এবং প্রযুক্তি গ্রহণ করে।

৩. রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ

মুসলিম রাষ্ট্রগুলো আধুনিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করতে পাশ্চাত্য মডেল অনুসরণ করেছে। সংবিধান, আইন, এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় পাশ্চাত্য ধারার প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

৪. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক চাহিদা

পশ্চিমা শক্তির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকার জন্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পশ্চিমা অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক মডেল গ্রহণ করেছে। বিশ্বব্যাংক, IMF ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে কাজ করতেও পশ্চিমা পদ্ধতি অনুসরণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

৫. সামাজিক সংস্কার ও আধুনিকীকরণ

অনেক মুসলিম রাষ্ট্র সামাজিক প্রগতির জন্য নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং মানবাধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে পশ্চিমা ধাঁচের নীতি গ্রহণ করেছে। এগুলোকে তারা নিজেদের উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে।

৬. সাংস্কৃতিক প্রভাব

গ্লোবলাইজেশনের ফলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, যেমন পোশাক, বিনোদন, এবং জীবনধারা, মুসলিম সমাজে প্রভাব ফেলেছে। গণমাধ্যম এবং ইন্টারনেট এই প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করেছে।

৭. প্রতিরক্ষা ও সামরিক উন্নয়ন

পশ্চিমা সামরিক প্রযুক্তি এবং কৌশল গ্রহণ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণে সহায়তা কর যদিও মুসলিম রাষ্ট্রগুলো পাশ্চাত্য সভ্যতার কিছু দিক গ্রহণ করেছে, তবুও তারা নিজস্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণের প্রক্রিয়া মূলত প্রয়োজন এবং সুবিধার ওপর নির্ভরশীল।